Department of Political Science

Dumkal College

For Semester II Honours Students

CC-T-4, GE and PCC 2: Indian Constitution

Synopses:

1. ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকার আলোচনা করো।
2. ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি আলোচনা করো।
3. ভারত একটি আধা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাবস্থা – ব্যাখ্যা করো।
4. ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো।
5. ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় স্বক্রিয়তা আলোচনা করো।

ভারতের সংবিধানে বর্ণিত সাম্যের অধিকারটি আলোচনা করো।

DUMKAL COLLEGE MURSHIDABAD ESTD 1999

৬ 3/2

সমাজে যে নানা ধরনের বৈষম্য থাকে তা দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই যে-কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এই বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্যের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাতেও (১৯৪৮) এই অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ওই ঘোষণায় বলা হয়েছে, "সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং কোনোরকম বৈষম্য ছাড়া সকলেই আইনের সমান সংরক্ষণ পাবার অধিকারী"।

ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল ধরে জাতপাত, ধর্মীয় সম্প্রদায় ও স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে তীব্র বৈষম্য রয়েছে। এই বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের সংবিধান রচয়িতারা সংবিধানে সাম্যের অধিকারটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কী ধরনের সমতা তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তার উত্তর ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় পাওয়া যায়। মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। একে বাস্তবায়িত করার জন্য সংবিধানের পাঁচটি ধারায় (14-18 ধারা) সাম্যের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিককালে একাধিক মামলায় সুপ্রিমকোর্ট ঘোষণা করেছে যে, সাম্যের নীতি ভারতের মৌল কাঠামোর অংশ। এই নীতিকে অস্বীকার করে কোনো আইন রচিত হলে, তা মৌল কাঠামোর বিরোধী বলে বাতিল হয়ে যাবে।

সাম্যের অধিকারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 14 নং ধারা। এই ধারায় সাধারণভাবে সাম্যের নীতিটি বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এই নীতি যে নাগরিক-অনাগরিক নির্বিশেষে ভারতে বসবাসকারী যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা বলা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "ভারতের সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে আইনের দৃষ্টিতে সমতা অথবা আইনের সমান সংরক্ষণ দিতে অস্বীকার করবে না"। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে যে, ভারত রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সব ব্যক্তি আইনের চোখে সমান এবং সকলেই আইন দ্বারা সমান সংরক্ষণের অধিকারী।

ভারতের সংবিধানে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা'র ধারণাটি ব্রিটেনের প্রথাগত আইন (common law) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রিটিশ অধ্যাপক A.V.D যে আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) তত্ত্বের কথা বলেছেন তার দ্বিতীয় নীতি। ভারতের

Semester-II H-CC-4 (Indian Constitution) Unit-2

প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুব্বারাও এবং কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ D.D. Basu -এর মতে, 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' একটি নেতিবাচক ধারণা। এর অর্থ, কোনো ব্যক্তির সমাজে পদমর্যাদা বা প্রতিপত্তি যতই থাক-না কেন, তিনি বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দরিদ্র কৃষক বা মজদুর পর্যন্ত যে-কোনো ব্যক্তিই আইন ভঙ্গ করলে সেই কাজের জন্য সমানভাবে দায়ী থাকবেন। আইনের চোখে সকলেই সমান। সবাই একইভাবে সাধারণ আইনের অধীন।

সাম্প্রতিক অতীতে ~~সুপ্রীম~~ সুপ্রিমকোর্ট ১৫ নং ধারার সদর্থক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন আশুতোষ গুপ্ত বনাম রাজস্থান রাজ্য ২(২০০২) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট বলেছেন যে, যে আইনের উদ্দেশ্য সংরক্ষণমূলক বৈষম্য, আদালত সেই আইনকে বৈধ বলে গণ্য করবে। এর অর্থ, ভারতীয় সমাজে বাস্তবে দীর্ঘকাল ধরে যে বৈষম্য আছে তা দূর করার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে ~~অ~~ অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিগতভাবে পক্ষপাত করা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এই নীতিগত পক্ষপাতকে বৈষম্যমূলক মনে হলেও, আসলে এর উদ্দেশ্য সমাজে ~~বৈষম্য~~ বৈষম্য দূর করে সাম্যের ক্ষেত্রকে ~~প্র~~ প্রসারিত করা, যাতে সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষও সমান সুযোগ ভোগ করতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের ১৫ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি কেবল ভারতীয় নাগরিকরাই ভোগ করতে পারবেন।—

১৫(১) ধারা অনুসারে, রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান অথবা এর যে-কোনোটির ভিত্তিতে বৈষম্য করতে ~~পা~~ পারবে না।

১৫(২) ধারা অনুযায়ী উক্ত কারণে সাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও প্রমোদ স্থানে প্রবেশ এবং সরকারি অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের অধিকার থেকে কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না।

93তম সংবিধান সংশোধনের (2006) দ্বারা 15(5) ধারা যুক্ত করা হয়েছে। এই ধারায় মূল কথা হল: রাষ্ট্র সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির নাগরিকদের অথবা তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে পারবে।

16(1) ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অধীনে কোনো পদে নিয়োগের বিষয়ে সব নাগরিকের সমান সুযোগ থাকবে এবং 16(2) ধারায় বলা হয়েছে শুধু ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান অথবা তার কোনো একটির ভিত্তিতে কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের অধীন কোনো চাকরিতে বা কোনো পদে নিয়োগের ব্যাপারে অযোগ্য হবে না অথবা [illegible] তার বিরুদ্ধে বৈষম্য করা যাবে না।

সংবিধানের 17 নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে: 'অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ করা হল এবং কোনোভাবে তা পালন নিষিদ্ধ [illegible]। অস্পৃশ্যতার জন্য কাউকে কোনো ব্যাপারে অযোগ্য করা হলে, তা আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। এই উদ্দেশ্যে সংসদকে আইন রচনার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে সংসদ 1955 সালে 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন' প্রণয়ন করেছে।

18 নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামরিক ও বিদ্যাবিষয়ক উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র আর কোনো উপাধি দিতে পারবে না। এবং ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনো ভারতীয় নাগরিক বিদেশি রাষ্ট্র থেকে উপাধি গ্রহণ করতে পারবেন না।

উল্লেখ্য বালাজী রাঘবন বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়ায় (1996) সুপ্রিমকোর্ট বলেছেন যে, ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী [illegible] 18 নং ধারার বিরোধী নয়।

স্বাধীনতার অধিকারগুলির একাধিক ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা আছে কোন অধিকারই অবাধ নয়। এই সীমাবদ্ধতা গুলি নিম্নলিখিত —

a) 14 নং ধারার সীমাবদ্ধতা গুলি হল -
i) ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালরা বিচার বিভাগীয় আদালতের থেকে অব্যাহতি ভোগ করেন।
এবং ii) বিধি সম্মত প্রয়োজনের জন্য একই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পৃথক আচরণ করবে না এবং যুক্তি সঙ্গত শ্রেণী বিভাগ করবে।

b) 15 নং ধারার ব্যতিক্রম -
i. 15 (3) ধারা অনুসারে রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
ii. 15 (4) ধারা বলে সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনগ্রসর নাগরিকদের / তফশিলি জাতি / উপজাতিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারে।
iii. 2006 সালে 93 তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যে 15(5) নং ধারা যুক্ত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও অনগ্রসর নাগরিকেরা / তফশিলি জাতি / উপজাতিরা আসন সংরক্ষণ লাভ করবেন।

c) 16 নং ধারার ব্যতিক্রম -
i. কোন বিশেষ প্রকারের চাকুরিতে ঐ রাজ্যের নাগরিকরা অগ্রাধিকার পেতে পারেন [16 (3) ধারা]।
ii. রাষ্ট্র অনগ্রসর নাগরিক / তফশিলি জাতি / উপজাতিদের জন্য চাকুরিতে সংরক্ষণ করতে পারে।
এবং iii. কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন পদ ঐ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, তবে পরিতাপের বিষয় হল, রাজনৈতিক সাম্য সীমিতভাবে অর্জন করা গেলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজও ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। এই ব্যবধান দূর করা না গেলে, জনগণের সার্বিক কল্যাণ হবে না, এবং প্রকৃত গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত হবে না।

DUMKAL COLLEGE • DUMKAL • MURSHIDABAD
DUMKAL COLLEGE Murshidabad
DUMKAL COLLEGE Murshidabad

ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারগুলি আলোচনা কর।

উঃ ভারত একটি বহু-ধর্ম-বিশিষ্ট (Multireligious) রাষ্ট্র। তাই ভারতের সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই অধিকারগুলির তাৎপর্য শুধু নিছক আইনগত নয়, বরং ঐতিহাসিক এবং সামাজিক। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে 1976 খ্রীঃ 42তম "সংবিধান সংশোধন" অনুসারে, যেহেতু ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত, তাই এই পরিপ্রেক্ষিতেও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের সংবিধানের Part-III অংশে 25-28 নং ধারায় এই অধিকারগুলি ভারতীয় নাগরিকদের "মৌলিক অধিকার" (Fundamental Right) হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে, ধর্মীয় মতাদর্শ বা ভাবাদর্শ-হীন রাষ্ট্রকে বা ধর্ম-বিরোধী-রাষ্ট্রকে বোঝায় না; ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হল সেই রাষ্ট্র যা কোন ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বা প্রচার-প্রসারে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় এবং যে রাষ্ট্র ধর্মমত-নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিককে সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি-সহ ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুতরাং, প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের নিজ ধর্ম-পালনের মৌলিক অধিকার ভারতে বর্তমান, সংবিধানের 25, 26, 27 এবং 28 নং ধারা এবং তাদের বিভিন্ন উপ-ধারাতে এই অধিকারগুলি বর্ণিত রয়েছে:

(1) 25(1) ধারা-অনুসারে, প্রত্যেক (প্রাপ্তবয়স্ক) ভারতীয় নাগরিক নিজস্ব বিবেক এবং মত-অনুযায়ী স্বাধীনভাবে যেকোন ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় রীতি ও আচার-আচরণ পালন এবং ধর্মমত প্রচার করতে পারে। যেকোন নাগরিক অন্য নাগরিকদের তাদের ইচ্ছাপূর্বক

(যেমনটি হয় বলপূর্বক নয়।) ধর্মান্তরকরণ ঘটাতে পারেনা, কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম গ্রহণে সক্ষম।

(২) ভারতীয় সংবিধানের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, যে কোন ধর্মসম্প্রদায় বা তার কোন অংশের ধর্মীয় কারণে ও সেবা দানের উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় সংগঠন, প্রতিষ্ঠান গঠনের অধিকার রয়েছে। ঐ সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের জন্য পরিচালনা ও সংস্থা স্থাপন করতে, বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও ভোগ করতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "Commissioner, Hindu Religious Endowments vs Sri Lakshmindra Tirtha Swamiar" - মামলায় 1961 খ্রীঃ সুপ্রীম কোর্ট রায় প্রকাশ করেন যে, ধর্মীয় সংগঠন ও সম্প্রদায় নিজস্ব রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং অন্য কর্তৃপক্ষ সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

(৩) সংবিধানের 27 নং ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, বিশেষ কোন ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতির জন্য কোন ভারতীয় নাগরিককে কর দানে বাধ্য করা যায় না।

এবং, (4) সংবিধানের 28 নং ধারা- অনুযায়ী, সরকারী বা সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর অনুমতি ব্যতীত বা অপ্রাপ্তবয়স্ক না হলে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের সম্মতি ব্যতীত, শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে ধর্ম-শিক্ষা দান করা যায় না।

কিন্তু, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় দান বা অছির (Trusteeship) মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলে, ঐ প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষা নিষিদ্ধ নয়।

কিন্তু, ভারতের সংবিধান-লিপিবদ্ধ এই মৌলিক অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ নয়।-

(a) 25 (1) নং ধারা অনুসারেই, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা, জাতীয় স্বার্থ এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সীমিত।

(b) 25 (2) নং ধারায়, সামাজিক সংস্কার ও উন্নয়ন এবং হিন্দু ধর্ম-প্রতিষ্ঠান সকল শ্রেণী ও অংশের হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ

করাতে পারে, প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে, "হিন্দু" কথাতে বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের বোঝায়।

সুতরাং, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রকৃতিতে বৈশিষ্ট্য আছে:
1. 25-30 নং ধারাগুলিতে বর্ণিত অধিকারগুলি ও স্বাধীনতাগুলি "Subject to public order, morality and health"; এবং এই অধিকারগুলি অবশ্যই প্রগতিমূলকভাবে প্রবর্তন-যুক্ত হবে।
2. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভারতীয় সংবিধানের 21 ধারার "জীবন ও স্বাধীনতার অধিকারের ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ।
3. 23 ধারায় বর্ণিত/নিষিদ্ধ "traffic in human beings" অনুসারে, ধর্মীয় অধিকারের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, মন্দিরে 'দেবদাসী' নিয়োগ নিষিদ্ধ।

কিন্তু, ভারতের রাষ্ট্রের 'ধর্মনিরপেক্ষ ভূমিকা' প্রশ্নাতীত নয়। বস্তুত, সাংবিধানিক -ভাবে ধর্মীয় জীবনের সাথে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। 25 নং ধারার 2 নং উপধারা রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রকারের 'secular' ভূমিকায় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। যেমন, "Dargah Khwaja Saheb Act of 1955"-এর মাধ্যমে সংসদ বিখ্যাত সুফি আজমীর-এর মাজারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছে রাষ্ট্রকে; আবার, "রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীন" থাকা সত্ত্বেও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য "বৈষ্ণোদেবী মন্দির"-এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এমনকি, "হজ যাত্রীদের" আর্থিক সাহায্য করে "ভারতীয় রাষ্ট্র"।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, "ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার" মৌলিক অধিকার হিসাবে পাশ্চাত্যের আরক্ষণীয় মডেল থেকে, যা "Universal Declaration of Human Rights" থেকে স্বতন্ত্র, কারণ, এর বিশেষ বৈচিত্র্য বর্তমান, তাই, ভারতে, এই ধারণা এবং এর সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত "ধর্মনিরপেক্ষতা"-র প্রত্যয় এক অনন্য "ভারতীয় সংস্কৃতি" সৃষ্টি করেছে, যার ভিত্তি হল: "সহিষ্ণুতা" (Toleration)। সাম্প্রতিক 'বাবরি মসজিদ-সংক্রান্ত' "রামজন্মভূমি মামলার রায়"-এর ক্ষেত্রে এই সত্যই উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

Semester II H-CC-4 (Indian Constitution) Unit-3

'ভারত একটি আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা' – ব্যাখ্যা কর।

"যুক্তরাষ্ট্র" শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ "Federal"-এর উৎপত্তি ল্যাটিন "Foedus" থেকে যার অর্থ "চুক্তিপত্র" বা "অঙ্গীকার পত্র"। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা সর্বপ্রথম উল্লেখিত হয় "বাইবেল"-এ, যেখানে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে চুক্তি বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাটি রাজনীতির অভিধানের একটি বিতর্কিত শব্দ ও প্রত্যয়। একটি "কেন্দ্র" ও "একাধিক" আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোন "রাজনৈতিক ব্যবস্থা"-য় ক্ষমতার বন্টন থাকলে, সেই ব্যবস্থাকে "যুক্তরাষ্ট্র" (Federation) বলা হয়। স্বাধীন ভারতের "শাসনতন্ত্র"-এ "যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো"-কে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য ও তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে ভারতের "যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি" সম্পর্কে। তাই, এটির আলোচনা ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করেছেন K.C. Wheare এবং "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র"-কে তিনি বলেছেন: "আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়" ব্যবস্থা ("quasi-federal" system)। এই মন্তব্য বিশ্লেষণ দাবী করে। ভারতীয় সংবিধানের "প্রস্তাবনা"য় বা অন্যত্র, "যুক্তরাষ্ট্র" শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। সংবিধানের "প্রথম অনুচ্ছেদে" ভারতকে "রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন" (Union of States) বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ভারত তাত্ত্বিকভাবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভারতকে "রাজ্যসমূহের ইউনিয়ন" বলার প্রধান তাৎপর্য আছে; ভারতীয় সংবিধানের রূপকার ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (   ) 1948 সালের 4 নভেম্বর "খসড়া কমিটি"-র সভাপতি হিসাবে ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন যে, দুটি কারণে 'যুক্তরাষ্ট্র' শব্দটির পরিবর্তে 'ইউনিয়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে:

i) "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র"-এর 13টি প্রদেশের মতো ভারতীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলি স্বেচ্ছাচুক্তির মাধ্যমে যুক্ত হয়নি।

এবং ii) আবার, চুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্ট নয় বলেই ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার নেই। তাই ভারতের বাস্তব যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো "জাতিরাষ্ট্রধর্মী" ও অবিনশ্বর প্রকৃতির। তাই, ভারত হল রাজ্যগুলির ইউনিয়ন যেখানে, একদিকে "শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্র" ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য উদ্ভূত অঙ্গরাজ্য অন্যদিকে সমন্বিত হয়েছে।

DUMKAL COLLEGE * MURSHIDABAD

ভারতের ইউনিয়ন কেন্দ্রিক ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে; একই সঙ্গে এর স্বাতন্ত্র্যকেও আলোকিত করে যা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হয় না। এর "যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য"-সমূহ হল:

ক. ভারতে একটি কেন্দ্র ও ২৮টি রাজ্য সরকার "কেন্দ্র", "রাজ্য" ও "যুগ্ম" তালিকায় বর্ণিত সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে নিজ ক্ষেত্রের শাসন পরিচালনা করে।

খ. অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মতো, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে "সংবিধানের প্রাধান্য" প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সংবিধান "লিখিত", সুপরিবর্তনীয় নয়, এবং রাষ্ট্রের "সর্বোচ্চ আইন"। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিন্যাস পরিচালনার উৎস হল "সংবিধান"।

গ. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভিভাবক হল "শীর্ষ আদালত" (Supreme Court)। আদালত তথা সামগ্রিক 'বিচার ব্যবস্থা" স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে।

কিন্তু, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনায় এককেন্দ্রিক, অ-যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতে বর্তমান:

1. ভারতে একমাত্র "জম্মু ও কাশ্মীর" ব্যতীত অপর কোন অঙ্গরাজ্যের নিজস্ব সংবিধান নেই (370 নং ধারা)।
২. যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যের সীমানা, নাম পরিবর্তন বা ভৌগোলিক পুনর্বিন্যাসের জন্য সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের "সম্মতি" প্রয়োজন, কিন্তু, 3(e) ধারা-অনুসারে, সংসদ এককভাবে উক্ত অঙ্গভূমি রাজ্যের সম্মতি ব্যতীতই সম্পাদন করতে পারে।
৩. ভারতে "সংবিধান সংশোধন"-এর ক্ষেত্রেও কেন্দ্র সরকারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। সংবিধান সংশোধনের যে কোন প্রস্তাব পার্লামেন্টেই করা যায়, 'রাজ্য আইন সভা"-তে নয়।
4. "রাজ্যপাল" হলেন অঙ্গরাজ্যের শাসক প্রধান; অথচ, 155 নং ধারায় উল্লিখিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির পরামর্শক্রমে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যপালকে নিয়োগ করেন, তার কার্যকালের মেয়াদও রাষ্ট্রপতির বকলমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।
5. কেন্দ্র রাজ্যের তুলনায় ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে, এবং, কেন্দ্র ও রাজ্যের হিসাব পরীক্ষা করে একটিমাত্রই সংস্থা -"মহাগাণনিক নিয়ামক ও পরীক্ষক"।
6. ভারতের রাষ্ট্রপতির তিন প্রকারের 'জরুরী অবস্থা' বিষয়ক ক্ষমতা (352-360 নং ধারা) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রবণতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে - জরুরী জাতীয় অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা", রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা ঘোষণার অধিকার এবং

তিন

আর্থিক জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা।
এবং, 7. ভারতের সংবিধানে "দ্বৈত নাগরিকতা" স্বীকৃত নয়।

সুতরাং, ভারতে প্রয়োজনীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান বর্তমান থাকলেও, রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব বিস্তৃত এবং, রাষ্ট্রপতির "জরুরী ক্ষমতা" প্রয়োগের মাধ্যমে কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতীয় কাঠামোকে "এককেন্দ্রিক" করে তুলতে পারে। "সংবিধান পরিষদে" আম্বেদকর বলেছিলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন ব্যবস্থাটি- "both unitary as well as federal according to time and circumstances."।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেই K.C. Wheare ভারতীয় ব্যবস্থাকে "আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়" বলেছিলেন, কারণ, তাঁর মতে, ভারত অতিরিক্ত এককেন্দ্রিক-প্রবণতা-যুক্ত একটি যুক্তরাষ্ট্র নয়; বরং, অতিরিক্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদান-সহ একটি এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু, অপর সংবিধান-বিশেষজ্ঞ সি. এইচ. অ্যালেকজান্ড্রোভিচ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে "অনন্য" (sui generis) বলেছেন। Wheare-এর বিরুদ্ধে তিনি এই ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উপাদানের "মিশ্রণ" হিসাবে অভিহিত করেছেন; তাঁর ভাষায় ভারতীয় ব্যবস্থা হল: "composite state of novel type"। আবার, Granville Austin-এর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই, ভারত হল একটি "সমবায়ী যুক্তরাষ্ট্র" ও এই কারণেই "জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ" বা "পরিকল্পনা কমিশন" ভারতে গঠিত হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে

প্রকৃতপক্ষে, কেন্দ্রীকরণের তীব্র প্রবণতা সত্ত্বেও, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রী রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রীয় বিন্যাসের অবসান ঘটেনি; বরং, বারবার সংকটের সম্মুখীন হয়ে এই যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষিত ও উত্তীর্ণ হয়েছে। নতুন রাজ্যের দাবী, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদ, কেন্দ্রের উপর অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যগুলির নির্ভরতা- প্রভৃতি ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতাকে আলোচিত করেছে। "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য"- এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই, ভারত তাত্ত্বিকভাবে "আধা-যুক্তরাষ্ট্র" হলেও, বাস্তবে তার অভিমুখ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে

Semester-II H-CC-4 (Indian Constitution) Unit-4

ভারতে জোট সরকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ও ক্ষমতা আলোচনা কর।

DUMKAL COLLEGE MURSHIDABAD ESTD 1999

Paper-3 / Half-I

উঃ ভারতে যেহেতু গ্রেট ব্রিটেনের মতো সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বর্তমান, এবং তাই যেহেতু ভারতের প্রকৃত শাসনক্ষমতার ভিত্তি হল মন্ত্রী-পরিষদ, স্বভাবতই মন্ত্রী পরিষদের মধ্যমণি হলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় রাজনীতিক অঙ্গনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তি হলেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অনুসারী। কিন্তু, সংবিধানে এ সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু উল্লেখিত নেই। ৭৫(১) ধারানুসারে, রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতারূপে যে মন্ত্রীসভা থাকে প্রধানমন্ত্রী হলেন তার নেতা। তাই, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে দুটি উৎস বর্তমান, সংবিধান বর্ণিত কয়েকটি ধারা ও ভারতে বিদ্যমান সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা ও রীতি।

সুতরাং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

ক. রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মন্ত্রীসভার সংযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। ৭৮ নং ধারানুসারে, কেন্দ্রসরকারের যেকোন প্রশাসনিক ও আইনগত বিষয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখা প্রধানমন্ত্রীর কাজ।

খ. ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তির নিয়োগ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি করেন। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল, মহাগণনা পরীক্ষক, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, এমনকী বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বময় ভূমিকা আছে।

গ. প্রধানমন্ত্রী সমমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য এই প্রবচন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে, মন্ত্রীপরিষদের নেতারূপে একনায়কে পরিণত হয়েছেন—

i) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে

বিরোধ হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়; আবার, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং, পদত্যাগ করে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনেও সক্ষম,

ii> প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে ক্যাবিনেট বণ্টন করেন আবার এর পুনর্বণ্টনও করতে পারেন। নেহেরু প্রয়োজন মনে করলেই দপ্তরের পুনর্বণ্টন করতেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধী মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ২৫ বার মন্ত্রীসভার পরিবর্তন করেছিলেন।

iii> প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্যাবিনেটের সভাপতি, তিনি মন্ত্রীসভার বৈঠক আহ্বান, তাতে সভাপতিত্ব করা, কর্মসূচী নিরূপন ও বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে নীতিগত দ্বন্দ্বের নিরসন প্রধানমন্ত্রীই করেন।

iv> ক্যাবিনেটের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে ও তাদের সম্পাদিত ~~কাজ~~ কাজের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঐক্য সাধন করেন।

v> বিদেশ নীতি বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে নীতিকর্তব্য স্থিরীকৃত হয়,

vi> প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের কমিটিগুলির সভাপতি হওয়ায় ওইগুলিকে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন।

ঘ. লোকসভার নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী; সাধারণত লোকসভায় নির্বাচিত দলের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি ওই দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী সরকারের প্রধান মুখপাত্র রূপে লোকসভার কাছে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করেন। বিতর্ককালে কোন মন্ত্রীর অসুবিধা হলে তিনি তাকে সাহায্য করেন, গুরুত্বপূর্ণ বিল তাঁকেই পাস করাতে হয়। বিরোধী পক্ষের সঙ্গে ~~সম্প~~ সম্পর্ক যথাসম্ভব সদ্ভাব রেখে সভাকে সুষ্ঠুভাবে গতিবান রাখার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। তিনি সমস্ত সভারই নেতা!

ঙ. সংবিধান অনুসারী, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভার অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাই সব।

তিন

১. তিনি নিজ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মন্ত্রীসভায় আমন্ত্রণ জানান।

২. সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেন।

৩. মন্ত্রীসভায় তপশিলি জাতি উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিদের স্থান দেন।

৪. ভবিষ্যৎ নেতারূপে সম্ভাবনাময় তরুণ নেতাদের মন্ত্রীসভায় স্থান দেন।

৫. ভারতের পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক কাঠামোর অনুকূলে পুঁজিপতি শ্রেণীর মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করেন।

এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখতে গিয়ে পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন ব্যক্তিকেও মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে হয়; এক্ষেত্রে, পার্লামেন্ট শুরুর ছয় মাসের মধ্যে ওই ব্যক্তিকে লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য হতে হয় এবং এখানেও প্রধানমন্ত্রীকেই সক্রিয় থাকতে হয়। প্রণব মুখার্জীর ক্ষেত্রে সরূপ হয়েছিল।

৬. প্রধানমন্ত্রী- আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান মুখপাত্র; বিদেশ নীতির গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকে। কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে তাঁর বিশেষ মর্যাদা আছে। বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের অভ্যর্থনা, শুভেচ্ছা বিনিময়, বিশেষ পরিস্থিতিতে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ব্যাখ্যাও তিনিই করেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত তাসখন্দ চুক্তি ও 1972 খ্রিঃ বাংলাদেশের সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী কৃত সহযোগিতা চুক্তি বা পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর সিমলা চুক্তি - আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী-র গুরুত্বময়তার দৃষ্টান্ত।

৭. লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বলে প্রধানমন্ত্রী সংসদে ও সংসদের বাইরে তিনি দলীয় মর্যাদার সংরক্ষক, দলীয় সংহতি ও বিরোধের মীমাংসাও তারই কাজ। দলের জনপ্রিয়তা,

চার

নির্বাচনে তার সাফল্য, জনমতের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের দ্বারা দলীয় প্রভাব বৃদ্ধি করার দায়িত্বও তার। 1971 খ্রীঃ বিভক্ত কংগ্রেস শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত প্রভাবে নির্বাচনে অভূতপূর্ব জয়লাভ করেছিল।

ঘ. প্রধানমন্ত্রী হলেন সমগ্র জাতির নেতা। জনমানসের ~~অ~~ অভিমত তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব, সততা আত্মত্যাগের মাধ্যমে একজন আদর্শ জননায়ক হতে সচেষ্ট থাকেন। জাতি ও দেশের সঙ্কটে তিনি জাতিকে মনোবলে উদ্বুদ্ধ করেন, সাহস দান করেন। তাই, জাতির নেতারূপে তাঁর ভূমিকা অভিনবত্বের দাবি রাখে।

ভারতে 1989 সালে নবম লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে ~~কার্যত~~ ভারতীয় কংগ্রেসের একদলীয় প্রাধান্যকারী দলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটে এবং বহু দলের সমর্থনে জোট সরকার/~~কোয়ালিশন~~ কোয়ালিশন সরকারের সূচনা ঘটে। এই ধারা এখনও পর্যন্ত অব্যাহত।

বিভিন্ন দলের সমর্থনে সরকার গঠিত হলে সেই সরকারকে কোয়ালিশন বা মোর্চার সরকার বলে। সাধারণ নির্বাচনের পর কেন্দ্রে অথবা রাজ্যে আইনসভার নিম্নকক্ষে কোনো-একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-থাকলে কোন দল সরকার গঠন করবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। এইরকম পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দলকে নিয়ে গঠিত কোয়ালিশন বা মোর্চার সরকার গঠিত। সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার সরকার একটি কোয়ালিশন সরকার।

একদলীয় প্রাধান্যকারী দলব্যবস্থা বলবৎ থাকার সময় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন, কোয়ালিশন যুগে বহুদলীয় ব্যবস্থার নানা ~~ব~~ বাধ্যবাধকতার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেমন, ক

পাঁচ

এককদলীয় সরকারে মন্ত্রীসভা গঠন বা সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন, সেই সুযোগ কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নেই। কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে সব সময় মনে রাখতে হয় যে, তাঁর মন্ত্রীপরিষদের স্থায়িত্ব সরকারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শরিক দলের সমর্থনের ওপর নির্ভর করে। ফলে, প্রধানমন্ত্রীকে নানারকম আপস করতে হয়। শরিকদল থেকে কারা মন্ত্রী হবেন তা স্থির করে সংশ্লিষ্ট দলগুলি, প্রধানমন্ত্রী নন।

তাছাড়া, কোয়ালিশন সরকারে প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজের দলের কর্মসূচি অনুসারে সরকার পরিচালনা করতে পারেন না। মোর্চার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শরিকদলের কাছে গ্রহণযোগ্য অভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তাঁকে সরকার পরিচালনা করতে হয়। জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার শরিকদলগুলির চাপে বিজেপি দল যেমন তাদের নিজস্ব অনেক কর্মসূচি সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনই বর্তমান সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার অন্তর্ভুক্ত শরিকদলগুলির বিশেষত — বাম দলগুলির চাপে কংগ্রেস (আই) দল তাদের নিজস্ব অনেক কর্মসূচি সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিল।

DUMKAL COLLEGE
MURSHIDABAD

সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা উল্লেখ করে 'বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা' ব্যাখ্যা কর।

1\. ভারত হল একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রত্যেক রাজ্যের স্বতন্ত্র 'বিচার বিভাগ' ভারতে নেই। বরং, 'এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা'-এর মতো একটি 'অখণ্ড বিচার ব্যবস্থা' বিদ্যমান। আবার, ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও 'আইন সভা'-এর প্রাধান্যে 'বিচার বিভাগ' ক্ষুন্ন নয়। বস্তুত, ভারতে বিচার বিভাগ প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে। এই বিচার বিভাগের শীর্ষে 'সুপ্রীম কোর্ট' অবস্থিত। ভারতে 'আইন' ও 'শাসন বিভাগ' যাতে সংবিধান-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না করতে পারে, তা নিরূপণের জন্য 'নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ' হিসাবে সুপ্রীম কোর্ট ভূমিকা পালন করে "বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা" (Judicial Review)-এর ক্ষমতাবলে; সংবিধানের সংরক্ষক, অভিভাবকের ভূমিকার পালনের সঙ্গেই সুপ্রীম কোর্ট তার নিজস্ব বিরোধ-বিচারের সাংবিধানিক দায়িত্বগুলিও নির্বাহ করে। তাই, ভারতীয় ব্যবস্থায় 'ন্যায়বিচার' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে 'সুপ্রীম কোর্ট' 'বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা' সৃষ্টি করেছে বিগত দশকগুলিতে।

ভারতের সংবিধানের 'পঞ্চম খণ্ড'-এর 'চতুর্থ অধ্যায়'-এ 124-147 নং ধারায় 'কেন্দ্রীয় বিচার বিভাগ' অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্ট-এর গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।-

ক) 124 (1) ধারায় বলা হয়েছে যে, একজন 'প্রধান বিচারক' এবং সংসদ-নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য বিচারকদের নিয়ে ভারতের 'সর্বোচ্চ আদালত' গঠিত হয়। বর্তমানে অন্যান্য বিচারকদের সংখ্যা 25 জন। 1 + 30 = 31

এবং, খ) মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুসারে 'রাষ্ট্রপতি' প্রধান বিচারপতির নিয়োগ করেন; এবং 124(2) নং ধারা-অনুসারে, প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বাধ্যতামূলক আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ করেন।

সংবিধানের 129 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্ট হল 'অভিলেখ আদালত' (Court of Records)। সুপ্রীম কোর্টের চার প্রকারের এলাকা বর্তমান:-

i> অনন্য মূল এলাকা: এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিরোধ-সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি ঘটে (131 নং ধারা)। তাছাড়া, এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের বিরোধ, ভারত সরকারের সঙ্গে একাধিক রাজ্যের যৌথ বিরোধ-সংক্রান্ত মামলা এই এলাকাভুক্ত।

ii> নির্দেশ, আদেশ বা লেখ জারির এলাকা: সংবিধানের 32 নং ধারায় বর্ণিত 'সাংবিধানিক প্রতিবিধান'-এর অধিকার যেহেতু একটি 'মৌলিক অধিকার', তাই তা খর্ব হলে সুপ্রীম কোর্ট তা রক্ষার জন্য "বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ", "পরমাদেশ", "প্রতিষেধ", "অধিকার-পৃচ্ছা" ও "উৎপ্রেষণ" ইত্যাদি 'লেখ' বা 'আদেশ' বা 'নির্দেশ' জারি করতে পারে।

* এই কারণেই ভারতে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা 28, কিন্তু হাইকোর্টের সংখ্যা 21 টি।

iii> আপীল এলাকা: পুনর্বিচারের প্রার্থনা করে উচ্চতম আদালতে এই ক্ষেত্রে আবেদন করা যায়। সংবিধানের ব্যাখ্যা-বিষয়ক মামলা, 'দেওয়ানি মামলা' ও 'ফৌজদারি মামলা' — এই তিনটি ক্ষেত্রে সংবিধানের যথাক্রমে 132, 133 ও 134 নং ধারায় এই এলাকার মামলা করা যায়।

এবং, ~~পরামর্শদান এলাকার~~ 136 নং ধারা অনুসারে, সুপ্রীম কোর্ট বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করতে পারেন।

এটি হল কোর্টের "অবশিষ্ট ক্ষমতা"। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

a> রায়, ডিক্রী, দণ্ডাজ্ঞা বা আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন;

b> যেকোন মামলা বা রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন;

ও c> যে কোন নিম্নতর আদালতের বিরুদ্ধে আবেদন।

এবং, iv> পরামর্শদান এলাকা: 143 নং ধারায়, এই এলাকার উল্লেখ করা হয়েছে; 'অতি যুক্তরাষ্ট্র' বা 'আত্মরক্ষা'-র সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা নেই। এই এলাকার মধ্যে, সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করেন এবং সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের সন্ধি, চুক্তি, অঙ্গীকার, সনদ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত বিরোধের মীমাংসা সম্পর্কে 'রাষ্ট্রপতি' সুপ্রীম কোর্টের অভিমত জানতে চাইতে পারেন।

ভারতের 'সুপ্রীম কোর্ট' সর্বোচ্চ আদালত হওয়ায় "বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা"-র ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নয়, এই ক্ষমতার প্রায়-অবিসংবাদিত প্রাধান্য কোর্টের, তবে এই ক্ষমতা ... এর মাধ্যমে বিগত দুই দশকে ধরে সুপ্রীম কোর্টের 'সক্রিয়তা' বৃদ্ধি পেয়েছে; একে "বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা" (Judicial Activism) বলা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকেই 'বিচার বিভাগীয় সক্রিয়তা' বলে। সংবিধান-প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক গুরুত্ব, সংবিধান-প্রণয়নের প্রথম দশকগুলিতে সুপ্রীম কোর্টের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের মাত্রা অত্যন্ত কম ছিল, এর মূল কারণ ছিল এই যে, ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রথম কয়েক দশকে সংবিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করা প্রবণতা ছিল সর্বোচ্চ আদালতের।

কিন্তু, 1967 সালে "গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলা"-য় সংবিধানের 13(2) নং ধারাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে সুপ্রীম কোর্ট বলেন যে, মৌলিক অধিকারের কোন ধারা সংসদ সংশোধন করতে পারবে না। এই মামলা থেকেই সুপ্রীম কোর্ট বিভিন্ন ধারায় নতুন অর্থ আরোপ করে সক্রিয়তার সূত্রপাত করে। যেমন, 1973 সালের "কেশবানন্দ ভারতী মামলায়" সুপ্রীম কোর্ট "সংবিধানের মৌলিক কাঠামো"-র ধারণা দান, 1994 সালে "এস. আর. বোম্মাই বনাম ভারত রাষ্ট্র" মামলায় 356 ধারাকে সুপ্রীম কোর্টের সমীক্ষার বিষয়ে পরিণত করা, ইত্যাদি।

অর্থাৎ, সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের শাব্দিক ব্যাখ্যাকার মাত্র নয়। কিন্তু, বিগত দুই দশকে সংবিধান ছাড়িয়ে এর ক্ষেত্র সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রসারিত

৩.

হয়েছে। এই ক্ষেত্র-সম্প্রসারণের কারণ হল-"জনস্বার্থ মামলার প্রচলন"। এই প্রকার
মামলায় আনুষ্ঠানিক মামলার মতো নিয়ম-পদ্ধতি মান্য করে আবেদন করা
জরুরী নয়। আবার, যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই ব্যক্তির হয়ে যেকোন ব্যক্তি/গোষ্ঠী
এই মামলা দায়ের করতে পারেন। এই ধরণের মামলার সূচনা ঘটে 'ভাগলপুর
জেলে' অপ্রমাণিত অভিযোগের ভিত্তিতে আটক ও অত্যাচারিত ভুক্তভোগীরা
মানুষ-সহ তার সহকর্মীদের মৌলিক অধিকার রক্ষার মামলার মাধ্যমে।
অবহেলিত দরিদ্র, অশিক্ষিত, অত্যাচারিত ভারতবাসী এই মামলার মাধ্যমে
'ন্যায়বিচার' লাভ করেছেন ও তা লাভ করতে গিয়ে, ৩২ নং ধারাকে রক্ষা করতে
গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সক্রিয়তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেরিত চিঠি, টেলিগ্রাম
বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের মাধ্যমেও এই মামলা করা যায়। তাই, এক কথায়
সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা বেড়েছে যাকে Upendra Baxi বলেছেন: "সুবিধাভোগী-
জারি প্রক্রিয়ার"!

তাছাড়া, "মানবাধিকারের", "বিচার ব্যবস্থা", সুশাসন ও স্বচ্ছতার মামলা ও পরিবেশ-
বিষয়ক মামলা – সুপ্রিম কোর্টের সক্রিয়তাকে "অতিসক্রিয়তা" (overactivi-
sm) করে তুলেছে। যদিও, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সর্বোচ্চ আদালত
প্রায়ই শাসন ও আইন বিভাগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে ফেলছে যা অনেকে,
অনৈতিক মনে হতে পারে। কিন্তু, প্রয়োজনে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সর্বোচ্চ
আদালত 142 (1) নং ধারা-অনুসারে "সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার" (complete justice)
প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোন বিষয়ে আদেশ/নির্দেশ জারি করতে পারেন। যেমনটি,
1998 সালে "সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত রাষ্ট্র" মামলায়
শীর্ষ আদালত এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 142 ধারা তাকে "অনন্য ক্ষমতা"
প্রদান করেছে যা আদালত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে।
যাক, সুপ্রিম কোর্টের সক্রিয়তা অর্থ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে!

প্রকৃতপক্ষে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকেরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়;
এবং মাত্র কয়েকজন বিচারকে অন্য বিভাগের বিষয়ে ন্যায়বিচারের নামে হস্তক্ষেপ
করে, তবে তা সুস্থ গণতন্ত্রের বিরোধী হবে। তবে, এই অতিসক্রিয়তার জন্য
সুপ্রিম কোর্ট একাই দায়ী নয়; আইন ও শাসন বিভাগ তাদের উপযুক্ত পরিষেবামো
সত্ত্বেও নিজেদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে বলেই, প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে
পারছে না বলেই বিচার বিভাগকে অযত্র হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। ভারতীয় গণতন্ত্র
"মূল্যবোধ" (values)-এর কারণেই সুপ্রিম কোর্টের "সক্রিয়তা"-এর মূল্য অনেক!